মানুষ চেনা

রূপক সাহা

পুনশ্চ

ভূমিকা

সাংবাদিকতা করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত অদ্ভুত ধরনের বহু চরিত্রের সম্মুখীন হয়েছি। বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হয়েছে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে। সাংবাদিকদের একটা বাড়তি সুবিধা, তারা এমন সব জায়গায় অবাধে বিচরণ করতে পারেন, যেখানে অন্যদের পৌঁছোনো সম্ভব নয়। সে সুন্দরবনের জলদস্যু কবলিত অঞ্চল হোক, অথবা নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন। কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ড হোক, অথবা মাওবাদী অধ্যুষিত জঙ্গলমহল। চোখে দূরবিন লাগিয়ে কখনও আমাকে দেখতে হয়নি, কোথায় কী হচ্ছে। আর সেই অভিজ্ঞতার কথাই লিখেছি এই বইয়ের নানা গল্পে।

একবার এক মনোবিদ আমাকে বলেছিলেন, 'আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে দেখবেন, হাসপাতাল বা নার্সিংহোমগুলো সব এমন রোগীতে ভরে যাবে, যারা মানসিকভাবে অসুস্থ। অনেক কঠিন কঠিন অসুখের ওষুধ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এটা এমন একটা রোগ, যার কোনো ওষুধ নেই।' সেইসময় মানসিক রোগীদের নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার জন্য রিসার্চ করছিলাম। সপ্তাহে দু দিন বেহালার এক মেন্টাল নার্সিংহোমে যেতাম। সেখানে দেখেছিলাম, ভোগবাদিতার এই যুগে মানুষের একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কি না মন, কত জটিল হয়ে গিয়েছে। আর সেই কারণেই মনোরোগীর সংখ্যা বাড়ছে। তারপরই 'মানুষ চেনা' গল্পটা লিখি। গল্পের নায়কের ধারণা, দূর থেকে মানুষ দেখলেই সে চিনতে পারে। সেই মানুষটির চরিত্র আন্দাজ করতে পারে। তার ধারণা যাতে মিলে যায়, ঈশ্বরের কাছে সে এই প্রার্থনাই করত রোজ। আর মিলে গেলে প্রভূত আনন্দ পেত। কিন্তু একদিন সে চাইল, তার ধারণা যেন না মেলে। কেন, তা নিয়েই 'মানুষ চেনা' গল্প।

'কালো বাঁশি' গল্পটাও অন্য ধরনের। 'পরিবর্তনের' পর মুম্বাইয়ের এক চিত্র পরিচালকের সঙ্গে নন্দীগ্রামে গিয়েছিলাম। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল, নন্দীগ্রামের ঘটনাবলি নিয়ে সিনেমা করবেন। সেখানেই একদিন সকালে থানার বাইরে গাছতলায় প্রথম দেখি, বংশী দুয়ারিকে। দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকতে। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে বিকালে ফের থানায় যাওয়ার পর চোখে পড়ে, সে ওই একইভাবে বসে আছে, কৌতূহলী হয়ে আশপাশের লোককে জিজ্ঞাসা করতেই বেরিয়ে এসেছিল, বংশী দুয়ারির দুর্দশার কাহিনি। যাত্রাজগতে ক্লারিনেট বাদক বংশী না কি একটা সময় মেদিনীপুর জেলায় খুব জনপ্রিয় ছিল। রাষ্ট্রপতির পদকও পেয়েছিল সে। কিন্তু নন্দীগ্রামে হামলার সময় হার্মাদ বাহিনী তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। তাকে মারধর করে। তার বউ আর মেয়েকে ধর্ষণ ও খুন করে। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর বংশী কিন্তু স্ত্রী-কন্যার খোঁজ নেয়নি। সে প্রথমেই জানতে চেয়েছিল, তার ক্ল্যারিনেটটা অক্ষত আছে কি না?

থানার বড়োবাবু বংশীকে কথা দিয়েছিলেন, ক্ল্যারিনেট উদ্ধার করে দেবেন। কিন্তু, তার আগেই তিনি অন্য কোনো থানায় বদলি হয়ে যান। বংশী অতশত বোঝে না। সে রোজ থানায় এসে একবার খোঁজ করে বড়োবাবু তার ক্ল্যারিনেটটা খুঁজে পেয়েছেন কি না? সারাদিন বড়োবাবুর আশায় সে গাছতলায় বসে থাকে। সন্ধে হলে লাঠি ভর দিয়ে তিন কিলোমিটার দূরে তার গ্রামে ফিরে যায়। বংশীর আসল নামটা আমি গল্পে দিইনি। জানি না, এখনও সে বেঁচে আছে কি না? কিন্তু, তার মুখটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে।

'বনবিবি' গল্পের দুগগা কইল্যাও আমার নিজের চোখে দেখা। জলদস্যু মন্টু সর্দারকে নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা লেখার জন্য সুন্দরবনে গিয়েছিলাম। তথ্য সংগ্রহের জন্য যেতে হয়েছিল কুলতলি থানায়। সেই বিকেলটা ছিল দুর্যোগের। আকাশ চিরে বৃষ্টি হচ্ছিল। থানার দারোগা গড়গড়ি সাহেবের সঙ্গে আগে থেকে পরিচয় ছিল। তিনি একবার মন্টু সর্দারকে গ্রেফতারও করেছিলেন। বাস্তবের সেই ঘটনার কথা শোনার জন্য একটা রাত্তির আমাকে থাকতে হয়েছিল থানায়। সেখানেই দেখি, দুগগা কইল্যাকে, থানার বারান্দায় জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে। মেয়েটি কে জানতে চাওয়ায়, গড়গড়ি সাহেব বলেছিলেন, মীন ধরে রোজগার করা মেয়েটি তিনজন পুরুষের সঙ্গে ঘর করেছে। তার আসল স্বামী কে, সেটা দারোগাবাবুকে বিচার করে দিতে হবে। বাঁদাবনের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিটা আমার কাছে সেই রাত্তিরে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আরও জেনেছিলাম, ওইসব অঞ্চলে দারোগাবাবুই শেষ কথা।

বইয়ে বাছাই করা পনেরোটি গল্পের মধ্যে সম্পর্কের গল্পও রয়েছে। যেমন, 'অযথা', 'মনে রাখা', 'চোখের ভাষা', 'অসুখের সুখ', 'ছেঁড়া শিকড়', 'মানুষ চেনা'। আছে গোয়েন্দা গল্পও। 'ফোর নাইন্টি এইট এ' আর 'ছবিও কথা বলে'। মিষ্টি প্রেমের গল্প লিখতে বরাবরই আমার ভালো লাগে। তার মধ্যে একটা 'গ্রুম করার গল্প' ও অন্যটা 'যাতনা কাহারে বলে।' ধনী পরিবারের ছেলে সায়ন গোয়েন্দা হতে চায়। দক্ষিণ কলকাতার এক শপিং কমপ্লেক্সে সে অফিস খুলে বসেছে। কিন্তু গোয়েন্দাগিরিতে সে ততটা চোস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কমপ্লেক্সে তার অফিসের পাশেই রয়েছে লাভলি মিত্রের বিউটি পার্লার। সেটা রমরমিয়ে চলে। জায়গা দখলের লড়াই নিয়ে রোজ রোজ সায়ন আর লাভলির মধ্যে মনোমালিন্য। সেই তিক্ত সম্পর্ক কী করে প্রেমে বদলে গেল, সেই ঘটনা নিয়েই 'গ্রুম করার গল্প'।

এই বইটি আমার প্রথম গল্প সংকলন। কবি সমরেন্দ্র দাস আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। প্রকাশক সন্দীপের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আপনাদের ভালো লাগলে খুশি হব।

রূপক সাহা

সূচিপত্র

মানুষ চেনা	১১
কালো বাঁশি	২১
গ্রুম করার গল্প	৪০
বনবিবি	৫৬
অযথা	৬৮
মনে রাখা	১০১
ছবিও কথা বলে	১০৮
ফোর নাইন্টি এইট এ	১১৭
চোখের ভাষা	১২৯
অসুখের সুখ	১৪৩
ছেঁড়া শিকড়	১৫০
হনিমুন	১৬১
মেডিক্যাল বিল	১৭৪
পাপ লিও না ঠাকুর	১৭৯
যাতনা যাহারে বলে	১৮৫

মানুষ চেনা

ট্রেনটা চাঁদনি চক স্টেশন ছাড়তেই মেয়েটাকে চোখে পড়ল সুনন্দর। গোল মুখ, পাতলা ঠোঁট, মসৃণ ত্বক, মুখে সামান্য দাগ পর্যন্ত নেই। চোখ দুটো আশ্চর্য সুন্দর। মাজা রং। পরনে হালকা হলুদ তাঁতের শাড়ি। ম্যাচিক ব্লাউজ। আঁচলটা ফেরতা দিয়ে কোলের কাছে আনা। হাতে চামড়ার একটা ডায়েরি। কামরার উজ্জ্বল বাতির নীচে বসা মেয়েটাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারছিল না সুনন্দ।

পাতাল রেলের কামরায় সুন্দরী মেয়েদের খুব দেখা যায়। টালিগঞ্জ থেকে রোজই সুনন্দকে শ্যামবাজার পর্যন্ত যেতে হয়। প্রতিদিন কিছু সুন্দরী মেয়ে ওর চোখে পড়ে। আর দেখলেই ওর মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। উলটো দিকের সিটে বসা হলদে শাড়ির মেয়েটাকে দেখে ধীরে ধীরে আজ তা হতে শুরু করল।

আজ অবশ্য পাতাল রেলে ভিড় কম। সকালের দিকে যতীন দাস পার্কের কাছাকাছি একটা কামরায় আগুন লেগেছিল। ঘণ্টা পাঁচেক বন্ধ ছিল পাতাল রেল। সবে চালু হয়েছে। কামরায় মাত্র তিন-চার জন এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে। মেয়েটার সামনেই, হ্যান্ডেল ধরে ঝুঁকে আছে একজন। ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিল না। মেয়েটাকে আরও ভালোভাবে দেখার জন্য সুনন্দ একটু কোনাচে হয়ে বসল। কানে ছোট্ট একটা দুল। প্রায় কাঁধের কাছে নেমে এসেছে ঘূর্ণায়মান চুল। মাঝখানে সিঁথে নয়, এক পাশে। সম্ভবত অবিবাহিত। একবার চোখাচোখি হতেই মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। মেয়েটার প্রোফাইল খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সুনন্দ। কপাল, নাক, চিবুক—এক সরলরেখায়। এক ধরনের মেয়েরা যাকে একবার ভালোবাসে, তাকে কখনও ঠকায় না। মেয়েটার পাশে সদ্য গোঁফ ওঠা একটা ছেলে বসে। তার ডান পাশে হিন্দুস্তানি একটা বউ, চকরা-বকরা শাড়িতে। মেয়েটা একা, না, তার সঙ্গে আর কেউ আছেন, সেটা বোঝার জন্য সুনন্দ চোখ বোলায় সিটে বসা প্রত্যেক যাত্রীর দিকে। পাতাল রেলের এই অঞ্চলটায় অবাঙালি যাত্রী ওঠেন বেশি। চাঁদনি, সেন্ট্রাল, গিরিশ পার্ক, শোভাবাজার ... শ্যামবাজার পর্যন্ত। হলদে শাড়ি পরা মেয়েটা কি অবাঙালি? সুনন্দ নিশ্চিত হতে পারল না। বোঝার জন্য ও মেয়েটার হাতের দিকে তাকাল। না, মেহেন্দি রাঙানো নেই। নেই রং-বেরং-এর কাচের চুড়িও। তার বদলে, এক হাতে, একটা মাত্র সোনার বালা। কপালে ছোট্ট একটা টিপ। বাহারি নয়, সাধারণ।

ভালো করে দেখে মেয়েটার মধ্যে অবাঙালিত্বের কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না সুনন্দ। এবং তখনই, বিষণ্ণ ভাবটা একটু একটু করে কাটতে শুরু করল।

কিছুদিন ধরে এই একটা অদ্ভুত নেশা পেয়ে বসেছে সুনন্দকে। মানুষ দেখা। অচেনা মানুষ দেখে তার সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা। সাত-আট মাস আগে, এসপ্লানেড ইস্টের ফুটপাত ধরে হাঁটার সময় পুরনো বইয়ের স্টলে একটা বই দেখে ও হঠাৎই আকৃষ্ট হয়। বইটার নাম 'ম্যান ওয়াচিং'। বাইরে থেকে দেখে একটা মানুষকে সঠিক চেনা যায় না। কিন্তু একটা মানুষ শারীরিক গঠন দেখে তার সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। চোখ, নাক, ঠোঁট, আঙুল, মুখের গড়ন—এক একটা লোক সম্পর্কে একেক রকম ধারণা দেয়। বইটা উলটে পালটে দেখে সুনন্দ রীতিমতো উত্তেজনা অনুভব করে। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তখনই ও কিনে ফেলে।

খুঁটিয়ে বইটা পড়ার পর থেকেই মানুষ চেনার নেশাটা ক্রমশ ওকে পেয়ে বসেছে। মেট্রো রেলের কামরায়, শ্যামবাজারের মোড়ে, এসপ্লানেডের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সুনন্দ আজকাল চুপচাপ মানুষ দেখে। মানুষ সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে। মনে মনে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে। একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ পায়। এই যেমন, হলদে শাড়ি পরা মেয়েটার সম্পর্কে এখন ও একটা ধারণা তৈরি করছে।

ট্রেনটা সেন্ট্রাল স্টেশন পেরিয়ে যেতেই সুনন্দ একটু নিশ্চিন্ত হল। মেয়েটাকে আরও মিনিট দুয়েক দেখা যাবে। মেয়েটা আশ্চর্য উদাসীন। কামরার আর কারও সম্পর্কে তার আগ্রহ নেই। মুখের রেখা একটুও বদলাচ্ছে না। প্রথম প্রথম পাতাল রেল চড়ার বিস্ময় ও কৌতূহল লেগে থাকে মানুষের চোখ-মুখে। এই মেয়েটার মুখে তার কোনও চিহ্ন নেই। এর মানে, প্রায়ই যাতায়াত করে। কলেজে পড়ে? মনে হয় না। কলেজ-ছাত্রী হলে শুধু একটা ডায়েরি নিয়ে বেরোত না। কাঁধে নিশ্চয়ই একটা সাইড ব্যাগ ঝুলত।

সামনের লোকটা গিরিশ পার্কে নামবে বলে দরজার দিকে সরে গেল। মেয়েটাকে এ বার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সুনন্দ। প্রচণ্ড একটা কৌতূহল ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ছবির মতো বসে আছে মেয়েটা। হাতের আঙুলগুলো সরু সরু। শিল্পীদের মতো। মেয়েটা কি গান গায়, অথবা ছবি আঁকে? হাতে ডায়েরি। হয়তো গান শিখতে যাচ্ছে। এই সিদ্ধান্তে আসার পরই মেয়েটার সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে শুরু করল সুনন্দ।

—আপনি কি গান শেখেন?

—কেন বলুন তো?

—না, এমনিই। আপনাকে দেখে মনে হল, তাই।

—আপনি কি গান ভালোবাসেন?

—তেমন কিছু নয়। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করতে পারি?

—করুন।

—আপনি কি রোজ ... মেট্রোতে যাতায়াত করেন?

—আপনি?

—রোজ। সপ্তাহে ছদিন। একটা ব্যাংকে চাকরি করি। শ্যামবাজারে। মেট্রো হওয়ায় আমার না খুব সুবিধে হয়েছে, জানেন।

—তাই বুঝি। কোত্থেকে ওঠেন?

—টালিগঞ্জ। থাকি মুর অ্যাভেনিউ, চেনেন?

ওখানে একটা ক্লাব আছে। টালিগঞ্জ অগ্রগামী। তার পাশেই আমাদের বাড়ি।

বাবা করে গিয়েছিলেন। এখন থাকি মা, আমি আর কাকলি।

—কাকলি কে?

—আমার স্ত্রী।

—বাবা?

—নেই, মারা গেছেন। বছর দশেক আগে।

বাড়ির সামনেই খুন হন। রাজনীতি করতেন।

—স্যাড, ভেরি স্যাড।

"আগলা স্টেশন ... শোভাবাজার ... পরবর্তী স্টেশন শোভাবাজার ... নেক্সট স্টপ শোভাবাজার।"

ঘোষণা শুনে কথা বলা বন্ধ করল সুনন্দ।

মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে। বেশ লম্বা। পাঁচ ফুট পাঁচ-সাড়ে পাঁচ হবে। কাকলির থেকেও দুতিন ইঞ্চি লম্বা। ছিপছিপে শরীর। মেয়েটা কি শোভাবাজার অঞ্চলেই থাকে? সুনন্দ নিশ্চিত হতে পারল না। মেট্রো থেকে বেরিয়ে হাটখোলা, বেনেটোলা, কুমারটুলি, রাজবল্লভপাড়া, বাগবাজার, হাতিবাগান ... অনেক জায়গায় যাওয়া যায়। আন্দাজ করা কঠিন, মেয়েটা কোথায় যাবে। এই অঞ্চলে কোনও কাজেও আসতে পারে। মেয়েটা কোত্থেকে উঠেছিল, তা সুনন্দর চোখে পড়েনি।

হঠাৎই তীব্র একটা কৌতূহল চাড়া দিয়ে উঠল সুনন্দর মনে। জানা দরকার। মেয়েটার সম্পর্কে জানা দরকার। অফিস যাওয়ার কথাও ভুলে গেল। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে পড়ল। এখনও চারটে সি এল পাওনা আছে। মেয়েটার জন্য একটা খরচ করা যেতে পারে। পরে, অন্য কোনও জায়গা থেকে ম্যানেজার সুকুমারদাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেই হবে। পাতাল রেলের সিঁড়ি দিয়ে মেয়েটার

প্রায় পাশাপাশিই সুনন্দ ওপরে উঠে এল। সামনেই সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-গ্রে স্ট্রিট জংশন। রাস্তায় নেমে হঠাৎ মনে হল, বাঁ দিকে পেট্রোল পাম্পের লাগোয়া বাড়িটা কাকলির দূর সম্পর্কের এক কাকার বাড়ি। সুনন্দ একটু সংকোচ বোধ করল। দিনের এই সময়টায় ওর ওখানে আসার কথা নয়। কাকলির ওই আত্মীয়দের কারও সঙ্গে যদি দেখা যায়? ছয়-সাড়ে ছয়মাস আগে ওর বিয়ে হয়েছে। মাত্র একবারই ওরা দু'জন এসেছিল এই কাকার বাড়িতে। এমনও হতে পারে, ও চেনে না অথচ ওকে চেনে, এমন কোনও লোক দেখে ফেলবে।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে, পা বাড়াবে কি না ইতস্তত করার ফাঁকে সুনন্দ দেখল, মেয়েটা ট্রামলাইন পেরিয়ে বাঁ দিকের ফুটপাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে হাটখোলার দিকে হালকা হলুদ রংটা যেন ওকে টানতে শুরু করল। নিজেকে আর আটকে রাখতে পারল না সুনন্দ। মেয়েটার পিছু পিছু হাঁটতে লাগল। মেয়েটার সম্পর্কে একটা ধারণা করে ফেলেছে। সেটা মিলিয়ে নিতে চায়। এ সব ক্ষেত্রে প্রতিবারই ও যা করে, আজও করল। আকাশের দিকে তাকিয়ে, ভগবানের কাছে মনে মনে একবার প্রার্থনা করল, যেন ওর ধারণাটা মিলে যায়। ট্রাম লাইনটা বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে চিৎপুরের দিকে গেছে। হাটখোলার মোড়ে পৌঁছে, মেয়েটা পুরনো আমলের একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। আধ মিনিটের মধ্যেই সুনন্দ সেই বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তার ওপর একটা অফিস ঘর। সাইনবোর্ড লাগানো। ঈশানী অপেরা। ঘরের সামনে রঙিন একটা পোস্টার। তাতে ওই অনেকের সঙ্গে মেয়েটারও ছবি। "সগৌরবে চলিতেছে, অবুঝ মেয়ের সবুজ মন। প্রধান ভূমিকায় জোনাকী।" সুনন্দ দেখল, অফিস ঘরে বসা একটা লোকের সঙ্গে মেয়েটা হেসে হেসে কথা বলছে। জড়তার কোনও চিহ্ন তার মধ্যে নেই। মেয়েটা তা হলে যাত্রাদলের অভিনেত্রী? ভাবতেই মনটা ফের বিষণ্ণ হয়ে গেল সুনন্দর। মিলল না। আজও মিলল না।

অফিসে পৌঁছে কাজে মন বসাতে পারল না সুনন্দ। ব্যাংকে শুধু সংখ্যা নিয়ে কাজ। সংখ্যাগুলোকে নতুন করে চেনার দরকার হয় না। সংখ্যার পাশে সংখ্যা—আর যাকে করুক, ওকে উত্তেজিত করতে পারে না। লেজার বইয়ে ওই সংখ্যাগুলোর পাশে কিছু জীবন্ত মুখ সব সময় যেন নড়াচড়া করে। সহকর্মীদের ঘোঁট, ইউনিয়নের রাজনীতি—এ সবের মধ্যে কখনও থাকে না সুনন্দ। ঠিক সময়ে ও অফিসে যায়। সুযোগ পেলে একটু আগেই বেরিয়ে আসে। সবার মাঝে থেকেও, নিজেকে ও বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করে। মানুষ দেখা, মানুষ চেনার, এই পাগলামির কথা আর শুধু জানে কাকলি। বিয়ের পর ওরা দুজন একবার বেড়াতে গিয়েছিল দিঘায়। দিন পাঁচেকের জন্য। ব্যাংকের একটা হলিডে হোম আছে ওখানে। সেখানে ওঠেনি। নতুন বউকে

খুশি করার জন্য সুনন্দ উঠেছিল ভালো একটা হোটেলে। সিঁড়িতে উঠতে নামতে, ডাইনিং টেবলে রোজ ওরা এক দম্পতিকে দেখত। ভদ্রলোক বেশ হ্যান্ডসাম। বয়স চল্লিশের ওপরে। ভদ্রমহিলা রীতিমতো সুন্দরী। তিরিশের নীচে। ভদ্রমহিলার সাজসজ্জায় এত রুচির ছাপ, সেটাই সুনন্দকে খুব টানত।

একদিন সন্ধ্যায় নিউ দিঘার বিচে ঘুরতে গিয়ে ওই সম্পতিকে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে দেখে সুনন্দ বলেছিল, "এই কাকলি, ওদের দেখছ।" সমুদ্রের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তখন কাকলি। অন্যমনস্ক হয়ে বলেছিল, "কাদের?"

—আরে ওই যে ... আমাদের হোটেলে যে কাপল-টা উঠেছে।

—ওহ্, তাই বল।

—আচ্ছা, কত বছর ওদের বিয়ে হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

—কী করে বলব।

—আমি বলব? বছর খানেকেও নয়।

ভদ্রলোকের লেট ম্যারেজ। এরপরই কাকলি বলেছিল, "ভদ্রমহিলা ভালো না।"

—কী বলছ তুমি?

—মনে হচ্ছে, তাই বললাম। মেয়েরা চট করে মেয়েদের চিনতে পারে। এরপরই প্রসঙ্গ পালটেছিল কাকলি, "এই দেখো, অন্ধকারের মধ্যেও ফেনাগুলো কেমন জ্বলজ্বল করছে।" কাকলির কথায় উৎসাহ নেই তখন সুনন্দর। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার কথাই ওর মাথায় ঘুরছে। ও বলেছিল, "ভদ্রলোক বিজনেসম্যান। সোনার চেন-টা লক্ষ করেছ। তিন-সাড়ে তিন ভরির কম নয়। চাকরি করলে এসব শখ মেটানো যায় না।"

—বাব্বা। তুমি এত খুটিয়ে দেখ না কি!

—হ্যাঁ, এটা আমার নেশা বলতে পারো। এই লোক দেখা। লোক চেনা। দুতিন দিন ধরে এদের দেখছি। শহুরে লোক বলে মনে হয় না। সন্ধেবেলায় লোকটা রিসেপশনে বলছিল, রসিদটা তৈরি করে রাখবেন। কাল সকালে যাওয়ার আগে মিটিয়ে দিয়ে যাব। শহুরে লোকেরা রসিদ কথাটা বলে না।

কাকলি মুখ টিপে হেসেছিল। নিউ দিঘার বিচ তখন প্রায় নির্জন। হু হু করে বাতাস বইছে। কাকলিকে নিয়ে ও বসেছিল একটা পাথরের ওপর। কাকলি একটু তফাতে। বিয়ের পর এক সপ্তাহও কাটেনি। কাকলির মধ্যে তখনও কিছুটা সংকোচ। সুনন্দর খুব ইচ্ছে করেছিল, ওই কাপল-টার মতো দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে বসে।

পরদিন সকালে রিসেপশনে কী একটা কাজে নেমেই সুনন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেছল একটা খবর শুনে। পুলিশের পোশাকে দুজন দাঁড়িয়ে। ভদ্রমহিলা বিচে খুন হয়েছেন।